দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শাস্ত্রপাঠ ও পাণ্ডিত্য মিথ্যা -- তপস্যা চাই -- বিজ্ঞানী

পণ্ডিত বেদাদি শাস্ত্র পড়িয়াছেন ও জ্ঞানচর্চা করেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন ও গল্পচ্ছলে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি) -- বেদাদি অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু সাধন না করলে, তপস্যা না করলে -- ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

“ষড় দর্শনে দর্শন মেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।

“তবে শাস্ত্রে যা আছে, সেই সব জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ করতে হয়। একজন একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলেছিল। কোথায় রেখেছে মনে নাই। তখন সে প্রদীপ লয়ে খুঁজতে লাগল। দু-তিনজন মিলে খুঁজে চিঠিখানা পেলে। তাতে লেখা ছিল, পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড় পাঠাইবে। সেইটুকু পড়ে লয়ে সে আবার চিঠিখানা ফেলে দিলে। তখন আর চিঠির কি দরকার। এখন পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড় কিনে পাঠালেই হবে।”

[***The Art of Teaching : পঠন, শ্রবণ ও দর্শনের তারতম্য***]

“পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, -- শুনার চেয়ে দেখা ভাল। গুরুমুখে বা সাধুমুখে শুনলে ধারণা বেশি হয়, -- আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না।

“হনুমান বলেছিল, ‘ভাই, আমি তিথি-নক্ষত্র অত সব জানি না -- আমি কেবল রামচিন্তা করি।’

“শুনার চেয়ে দেখা আরও ভাল। দেখলে সব সন্দেহ চলে যায়। শাস্ত্রে অনেক কথা তো আছে; ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না হলে -- তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি না হলে -- চিত্তশুদ্ধি না হলে -- সবই বৃথা। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল -- কিন্তু পাঁজি টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না! এক ফোঁটাই পড়, তাও না।”

[***বিচার কতদিন -- ঈশ্বরদর্শন পর্যন্ত -- বিজ্ঞানী কে?***]

“শাস্ত্রাদি নিয়ে বিচার কতদিন? যতদিন না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়। ভ্রমর গুনগুন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ ফুলে না বসে। ফুলে বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলে আর শব্দ নাই।

ভক্ত -- ঈশ্বরদর্শনের পরও শরীর থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- কারু কারু কিছু কর্মের জন্য থাকে, -- লোকশিক্ষার জন্য। গঙ্গাস্নানে পাপ যায় আর মুক্তি হয় -- কিন্তু চক্ষু অন্ধ যায় না। তবে পাপের জন্য যে কয় জন্ম কর্মভোগ করতে হয় সে কয় জন্ম আর হয় না। যে পাক দিয়েছে সেই পাকটাই কেবল ঘুরে যাবে। বাকীগুলো আর হবে না। কামক্রোধাদি সব দগ্ধ হয়ে যায়, -- তবে

শরীরটা তাকে কিছু কর্মের জন্য।

পণ্ডিত -- ওকেই সংস্কার বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বরদর্শন করে -- তাই তো এরূপ এলানো ভাব। চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হতে লীলাতে থাকে, কখনও লীলা হতে নিত্যেতে যায়।

পণ্ডিত -- এটি বুঝলাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- নেতি নেতি বিচার করে সেই নিত্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পৌঁছয়। তারা এই বিচার করে -- তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন। নিত্যে পৌঁছে আবার দেখে -- তিনি এই সব হয়েছেন -- জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

“দুধকে দই পেতে মন্থন করে মাখন তুলতে হয়। কিন্তু মাখন তোলা হলে দেখে যে, ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল।”

পণ্ডিত (ভূধরের প্রতি, সহাস্যে) -- বুঝলে? এ বুঝা বড় শক্ত!

শ্রীরামকৃষ্ণ -- মাখন হয়েছে তো ঘোলও হয়েছে। মাখনকে ভাবতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোলকেও ভাবতে হয়, -- কেননা ঘোল না থাকলে মাখন হয় না। তাই নিত্যকে মানতে গেলেই লীলাকেও মানতে হয়। অনুলোম ও বিলোম। সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর এই অবস্থা! সাকার চিন্ময়রূপ, নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

“তিনিই সব হয়েছেন, -- তাই বিজ্ঞানীর ‘এই সংসার মজার কুটি’। জ্ঞানীর পক্ষে ‘এ সংসার ধোঁকার টাটি।’ রামপ্রসাদ ধোঁকার টাটি বলেছিল। তাই একজন জবাব দিয়েছিল, --

এই সংসার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি।
ওরে বদ্যি নাহিক বুদ্ধি, বুঝিস কেবল মোটামুটি ॥
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসের ছিল ক্রটি।
সে এদিক-ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি ॥

(সকলের হাস্য)

“বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষরূপে সম্ভোগ করেছে। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। বিজ্ঞানী দুধ খেয়েছে আর খেয়ে আনন্দলাভ করেছে ও হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।”

“তবে একটি আছে, ঈশ্বরকে দর্শনের পরও কথা চলতে পারে। সে-কথা কেবল ঈশ্বরের আনন্দের কথা, -- যেমন মাতালের ‘জয় কালী’ বলা। সর ভ্রমর ফুলে বসে মধুপান করার পর আধ আধ স্বরে গুনগুন করে।”

বিজ্ঞানীর নাম করিয়া ঠাকুর বুঝি নিজের অবস্থা ইঙ্গিতে বলিতেছেন।

“জ্ঞানী ‘নেতি নেতি’ বিচার করে। এই বিচার করতে করতে যেখানে আনন্দ পায় সেই ব্রহ্ম।

“জ্ঞানীর স্বভাব কিরূপ? -- জ্ঞানী আইন অনুসারে চলে।

“আমায় চানকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কতকগুলি সাধু দেখলাম। তারা কেউ কেউ সেলাই করছিল। (সকলের হাস্য) আমরা যাওয়াতে সে-সব ফেললে। তারপর পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আমাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল। (সকলের হাস্য)

“কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা জিজ্ঞাসা না করলে জ্ঞানীরা সে-সব কথা কয় না। আগে জিজ্ঞাসা করবে এখন, তুমি কেমন আছ। ক্যায়সা হ্যায় -- বাড়ির সব কেমন আছে।

“কিন্তু বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। তার এলানো স্বভাব -- হয়তো কাপড়খানা আলগা -- কি বগলের ভিতর -- ছেলেদের মতো।

“ঈশ্বর আছেন এইটি জেনেছে, এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে জেনেছে সেই জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জ্বেলে রাঁধা, খাওয়া, হেউ-ঢেউ হয়ে যাওয়া, যার হয় তার নাম বিজ্ঞানী।

“কিন্তু বিজ্ঞানীর অষ্টপাশ খুলে যায়, কাম-ক্রোধাদির আকার মাত্র থাকে।”

পণ্ডিত -- “ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।”[১]

[*পূর্বকথা -- কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি গমন -- ঠাকুরের বিজ্ঞানীর অবস্থা*]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- হাঁ, একখানা জাহাজ সমুদ্র দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ যত লোহা-লক্কড়, পেরেক, ইস্ক্রু উপড়ে যেতে লাগল। কাছে চুম্বকের পাহাড় ছিল তাই সব লোহা আলগা হয়ে উপড়ে যেতে লাগল।

“আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি যেতাম। একদিন গিয়েছি, সে বললে, তুমি পান খাও কেন? আমি বললাম, খুশি পান খাব -- আরশিতে মুখ দেখব, -- হাজার মেয়ের ভিতর ন্যাংটো হয়ে নাচব! কৃষ্ণকোশোরের পরিবার তাকে বকতে লাগল -- বললে, তুমি কারে কি বল? -- রামকৃষ্ণকে কি বলছ?

“এ-অবস্থা হলে কাম-ক্রোধাদি দগ্ধ হয়ে যায়। শরীরের কিছু হয় না; অন্য লোকের শরীরের মতো দেখতে সব -- কিন্তু ভিতর ফাঁক আর নির্মল।”

ঠাকুর একটু চুপ করিলেন ও পণ্ডিতকে তামাক খাইতে বলিলেন। পণ্ডিত দক্ষিণ-পূর্বের লম্বা বারান্দায় তামাক খাইতে গেলেন।

---

[১] মুণ্ডকোপনিষদ্ [২।২।৮]